ঐতিহ্য রজতজয়ন্তী গ্রন্থমালা

কথাসাহিত্যসমগ্র

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঐতিহ্য

দীমা ও নাফিস'কে
স্নেহ ও শুভেচ্ছায়

মুখবন্ধ

কথা ছিল লেখক হিসেবে আমি কথাসাহিত্যেরই চর্চা করবো। শুরুটা হয়েছিল ওইভাবেই। কিশোর বয়সে আমি ছোট ছোট গল্প লিখেছি দৈনিক *আজাদ* ও দৈনিক *সংবাদ*-এর কিশোর পাতাতে। কিন্তু সাহিত্যসেবার ওই ধারাটা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ মনে হয় দু'টি জিনিসের অপ্রতুলতা– অভিজ্ঞতার এবং ধৈর্যের। আমার লেখাতে বৃত্তের কথা বহুভাবে এসেছে, বস্তুত বৃত্ত ভাঙার বাসনা আমার জন্য একটি চালিকাশক্তি বটে। কিন্তু নিজে আমি যে বৃত্ত ভেঙে বের হতে পেরেছি তা নয়। মধ্যবিত্ত গণ্ডির ভেতরই রয়ে গেছি। তার ফলে ঘাটতি ঘটেছে সামাজিক অভিজ্ঞতার। গল্প-উপন্যাস লেখায় লেগে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপাদানের সরবরাহ হাতের কাছে নিয়মিত পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত আমার আপাত শান্তভাবের ভেতর একটা তাড়াহুড়া কার্যকর থাকে। তদুপরি চাপও ছিল বিভিন্ন রকমের কাজের। ফলে কথাসাহিত্য সৃষ্টির নিবিষ্টচিত্ততাকে দখলে রাখাটা সহজসাধ্য হয়নি। তবে এরই মধ্যে আমি কয়েকটি গল্প ও দু'টি উপন্যাস লিখেছি। কিশোরদের জন্য গল্প এবং উপন্যাসও লেখা হয়েছে। টেলিভিশনের জন্য নাটকও আমার রচনা তালিকাতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রবন্ধেও আমি গল্পবলার ভাবটা আনতে চেষ্টা যে করিনি তাও নয়।

প্রকাশনা সংস্থা 'ঐতিহ্য'র স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইমকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমার লেখা এগারোটি ছোটগল্প ও দু'টি উপন্যাসকে একত্র করে 'কথাসাহিত্যসমগ্র' হিসেবে প্রকাশের জন্য। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকদিনের। ঈদসংখ্যা থেকে খুঁজে বের করে 'শেষ নেই' নামের উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে তারাই প্রকাশ করেছিলেন। ইদানীং দেখছি পুরানো সম্পর্ক আরও নিবিড় হচ্ছে। আমার লেখার দু'টি 'সমগ্র' তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। এটি তৃতীয়। প্রথমটি ছিল সাহিত্যে নারী চরিত্র নিয়ে আমার লেখা প্রবন্ধগুলোর সংগ্রহ; দ্বিতীয়টি অনুবাদ-করা রচনার সমগ্র। আগের দু'টির মতোই এই নতুন সমগ্রটিও পাঠকদের কাছে হাজির করার পেছনে কবি ও সাহিত্যানুরাগী পিয়াস মজিদের অদম্য উৎসাহ কাজ করেছে। তার ওপর আমার ভরসার মাত্রা দেখছি ক্রমবর্ধমান।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
১০ জুন, ২০২৫

সূচি

গ ল্প গ্র ন্থ

ভালমানুষের জগৎ ১১
- সীমান্তে ১৩
- হারাবার কিছু নেই ৩৯
- পিঠের বোঝা ৫৩
- ভালমানুষের জগৎ ৭৪
- জাহানারার চিঠিপত্র ৯৫
- খেলার সাথী ১১৯
- হাফিজুর রহমানের অগ্রযাত্রা ১৩৩
- অভিন্ন ১৫৬
- কোনো দাম নেই ১৬৩
- কান্না ১৬৯
- তলোয়ার ১৭৫

উ প ন্যা স

শেষ নেই ১৭৯

কণার অনিশ্চিত যাত্রা ৩২৫

প রি শি ষ্ট ৪৪৫

ভালমানুষের জগৎ

সীমান্তে

হেলেনের গলাটা কি কাঁপছিল টেলিফোনে, নাকি যন্ত্রেরই দোষ, নাকি তিনি নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন টেলিফোন পেয়ে? যে কোনোটা হতে পারে, তিনটে এক সাথে হওয়াতেও দোষ নেই। তবে বোঝা গেল হেলেন আসছে। আগস্টে। তারিখ দিয়েছে ষোলই। অর্থাৎ ঠিক ঊনত্রিশ দিন পরে। ঊনত্রিশ দিন পরে রাত সাড়ে ন'টায় ঢাকায় নামবে। বলল, ঢাকার বাতাস প্রাণ পুরে নিয়ে নেবো, আব্বা।

এক সময়ে তো কবিতা লিখত হেলেন। আজমল আলী ভূইয়ার মনে পড়ে। এখনো কি লেখে? এখন কোথায় কত দূর চলে গেছে। সেই অস্ট্রেলিয়াতে। এখন কি আর কবিতা লিখবে সে? কে পড়বে, কে শুনবে। তার স্বামী বিদেশি। কোন ভাষায় কথা বলে হেলেন তার স্বামীর সঙ্গে? ছেলেটি তো জার্মান। সে কী করে বুঝবে বাংলা কবিতা? হেলেন কি বাংলা ভুলে যাবে? না, তা মনে হলো না। একেবারেই আগের মতো। তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি প্রাণবন্ত। পরিষ্কার বাংলা কথা।

আজ সকালটা অন্যরকম মনে হলো আজমল আলীর। খবরটা ছড়িয়ে গেল মুহূর্তে। হেলেন আসছে। নয় বছর পরে আসছে সে। ক্যানবেরা থেকে সিডনি। সিডনি থেকে ব্যাংকক। তারপর ঢাকা। ছবির মতো বলে গেল। তারপর নামবে ঢাকায়, রাত ন'টায়। ষোলই আগস্ট, বৃহস্পতিবার। কেউ যেন উপস্থিত থাকে এয়ারপোর্টে।

আজমল আলী আবার নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন। যেমন তিনি নিতেন তাঁর কর্মজীবনে। অফিসে নিতেন। পরিবারে নিতেন। না, পরিবারে ঠিক নিতে পারতেন না। সব সময়ে নয়। পরিবারে বিরোধ ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল স্ত্রীর সঙ্গে। অনেক ছিল হোসনেআরা বেগমের অভিযোগ। এখনো আছে। এখন বলেন, সুযোগ পেলেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন যে ছেলেমেয়েদের সব পর করে দিয়েছেন

আজমল আলী। ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর কোল থেকে। কেমন করে নিলেন সেটা জিজ্ঞেস করেন না ভূইয়া সাহেব। এখন তর্কে যান না। এখন তিনি শোনেন বেশি, বলেন কম। এককালে তর্ক করতেন।

সরকারি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে যে চাকরি নিয়েছিলেন সিভিল সাপ্লাইতে সে নিয়ে একটা ক্ষোভ ছিল তাঁর ভেতরে। স্ত্রীর পক্ষ বাধ্য করেছিল তাঁকে— তিনি মনে করেন। স্ত্রী পক্ষ ব্যবসায়ী, সেকালে গেঞ্জির কল ছিল নিজেদের, ফতুল্লাতে, এখন আরো বেড়েছে। টেক্সটাইল মিল হয়েছে। সেই যে ইতিহাসের প্রথম শ্রেণী নিয়ে অধ্যাপনা করলেন না, করলেন ফুড কন্ট্রোলারি, তার জন্য ক্ষোভ ছিল চাপা। সেই প্রথম দিকের ব্যাপার। তারপর তিনি সেসব ঠিকই করেছেন যা যা তাঁর করবার কথা। বাড়ি হয়েছে একাধিক। অভাব নেই। কিন্তু সেকালে যেভাবে তর্ক করতেন স্ত্রীর সঙ্গে তা এখন আর করেন না। হোসনেআরা বেগম একাই বলেন কথা। আজমল আলী ঘরে থাকলে শোনেন অথবা শোনেন না। পারলে বের হয়ে যান, বাজারে অথবা ভ্রমণে। সকালে প্রাতঃভ্রমণ নিয়মিত। বিকেলেও হাঁটেন কিছুটা সময়।

সেদিন সোমবার সকালে ঠিক ৬টা ৩০ মিনিটে ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরে টেলিফোনটা পেলেন তিনি। দিন চলছিল যেমন চলে। উঠেছেন। পানি খেয়েছেন এক গ্লাস। অজু করে নামাজ পড়েছেন। তারপর ঠিক ৫টা ৩০ মিনিটে কেডস পরে বের হয়ে গেছেন প্রাতঃভ্রমণে। দেখা হয়েছে ঠিক তাঁদের সঙ্গেই যাঁদের সঙ্গে রোজ দেখা হয়। প্রিন্সিপ্যাল, এসপি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি, তিনজনেই ছিলেন। তিনজনই অবসরপ্রাপ্ত, আজমল আলীর মতোই তাঁরা প্রাতঃভ্রমণে নিয়মিত আসেন, এসেছিলেন সেদিনও। সেদিনও বেশির ভাগ কথা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই বলেছিলেন, যেমন তিনি রোজ বলেন। রসিকতা করেছিলেন যেমন তিনি রোজ করেন। কার সন্তান কী করছে সেই প্রসঙ্গটাও এসেছিল। আজমল আলী সাহেব শুনছিলেন। কেমন যেন মনে হয়েছিল তাঁর এই যে হাঁটা এর বুঝি কোনো অন্ত নেই, বুঝি কোনো গন্তব্য নেই। নেই কি? ওই যে সময় যখন শেষ হয়ে যায়, সামনে জেগে ওঠে অন্ধকার, তখন, তখন কী হয়? এই কথাটা আজকাল মনে আসে আজমল সাহেবের। কাউকে বলা যায় না। সেদিনকার সেই সকালেও কথাটা মনে এসেছিল তাঁর। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যখন নিজের কর্মজীবনের এক সহকর্মীর স্ত্রীর বিষয়ে প্রায়-অশ্লীল গল্প বলছিলেন তখন আজমল আলী বেরসিকের মতো অন্য কথা ভাবছিলেন। তবে হেসেছিলেন ঠিকই, গল্প শুনে।

বাসায় ফিরে জুতো খুলছেন এই সময়ে বাজল টেলিফোন। সাড়া দেয়ার মতো উৎসাহ ছিল না তাঁর। নিশ্চিত ছিলেন যে, ফোন এসেছে ছেলে শাহেদের। সকলের ছোট সে। কিন্তু বেশ বড় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। এমএ করেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে। কিন্তু করছে ব্যবসা। অনেকটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কই বটে। আজ যায় ব্যাংকক, কাল সিঙ্গাপুর। এখন নাকি যাবার কথা কাতারে। কি ব্যবসায় সেটা ঠিক বোঝেন না আজমল সাহেব। হেলেনকে বোঝেন না, সেই দুই ছেলেকেও বোঝেন না যারা আমেরিকায় আছে। ডাক্তার একজন, একজন ইঞ্জিনিয়ার। তারা চলে গেছে। শাহেদ এখন তার মায়ের ছেলে। একমাত্র সন্তান, মা ছাড়বেন না। অন্য তিনজনকে তো বাপ ঘরছাড়া করেছে, এটিকে তিনি ছাড়ছেন না। ছেলেই এখন বাড়ির কর্তা আসলে।

তারই ফোন এসেছে। আজমল আলী মনে করছিলেন। বিরক্তও হয়েছিলেন। এখনই শুনবেন, 'কে শাহেদ? ও, আচ্ছা আঙ্কল। শাহেদকে একটু ডেকে দিন না।' শাহেদের সেই ইয়ার-বন্ধুটির গলা যার সম্পর্কে হোসনেআরার গভীর সন্দেহ যে, তাঁর ভাল ছেলেটাকে বোকা পেয়ে সে তার বোনটিকে শাহেদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার যাবতীয় প্যাঁচ হামেশাই কষছে। অনেকটা ক্লান্ত, যান্ত্রিকভাবেই ফোনটা ধরেছিলেন আজমল আলী। শোনেন, হেলেন আসছে। হেলেন। ষোলই আগস্ট। ঠিক ঊনত্রিশ দিন বাকি। চারদিকে সেই ওই একই খবর। বদলে গেছে সকাল, এই পুরনো বাড়ি, শান্তিনগরের এই পুরাতন পরিবেশ। ঝলমল করছে। কাঁপছেও যেন।

একলা? না, একলা আসছে না। স্বামী আসছে সাথে। ছেলেও আসছে, দেড় বছর যার বয়স। দেখা হয়নি। নাতি দেখেননি, মেয়ের জামাই দেখেননি। কী যেন নাম? হেনরী। হেনরী হেস বোধ হয়। সেই হেলেন যে কবিতা লিখত, ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নিত, সে এখন মিসেস হেলেন হেস হয়েছে বোধ হয়। স্কার্ট পরে কি? একলা এলেই হয়তো ভাল ছিল। স্বাভাবিক হতো। কিন্তু ওর স্বামীরই নাকি বেশি উৎসাহ। সে কথা হেলেন আগে বলেছে, চিঠিতে। নিয়মিত চিঠি লেখে হেলেন, যা ছেলে দুটির কেউই লেখে না। হেলেন কিন্তু টাকাও পাঠায় মাঝে মাঝে। ছেলেরাও পাঠিয়েছিল টাকা। সে টাকা দিয়ে শাহেদ এখন ব্যবসা করছে। কিন্তু এখন আর পাঠায় না। তা দরকারও পড়ে না। বাড়ি ভাড়া পান। পেনশনের টাকা পান। শাহেদও খরচ করে প্রচুর। ফিক্সড ডিপোজিটে কয়েক লাখ জমা আছে হোসনেআরার নামে। তার সুদ আসে। তবুও হেলেন টাকা পাঠায়। পাঁচ-ছয় হাজার পাঠিয়ে দেয় একেকবার। বলে, আপনার না লাগুক আব্বা, গরিব আত্মীয়স্বজন তো

আছে। মেয়েটি আবার কড়া বামপন্থি ছিল এখানে থাকতে। হয়তো এখনো আছে। চিঠি পড়ে তো তাই মনে হয়।

তা হেনরী না এলে ক্ষতি ছিল না। হাজার হোক বিদেশি। হেলেন অবশ্য অন্য কথা বলে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ওই সাহেবেরই কৌতূহল ও উৎসাহ বেশি তার নিজের চেয়ে। বলেছে খুব গোঁড়া বামপন্থি নাকি। এন্টি-নিউক্লিয়ার মার্চে যোগ দিতে গিয়ে পরিচয়। হেনরী ম্যানচেস্টারে এসেছিল বিজ্ঞান পড়তে, হেলেন গিয়েছিল অর্থনীতি পড়বে বলে। অনেক বিষয়ে মিল দেখা গেছে তাদের মতামতে। হেলেন নিজেও তো সমাজতন্ত্রের কথা বলত খুব করে। একাত্তরে গ্রামে গিয়েছিল সবার সঙ্গে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের ছাত্রী সে। গ্রামে গিয়ে বলে, মেয়েদের সংগঠিত করবে। রুখে দাঁড়ানো চাই। বন্দুক দরকার।

শাহেদকে ঘুম থেকে উঠাতে হলো ঠেলাঠেলি করে। 'কি? আগুন লেগেছে নাকি?' ওই রকমই কথাবার্তা তার। দেরি করে ফেরে। রাত করে শোয়। সকাল সাতটা অত্যন্ত আর্লি তার জন্য। মা ছাড়া উঠাবে তাকে এমন সাহস আর কারো নেই এ বাড়িতে।

মা আজ বিশেষ সাহসী। 'ওঠ। ওঠ। হেলেন আসবে, হেলেন'। 'কই কোথায়', শাহেদকে দেখা গেল আরো বেশি উৎসাহী। না, আসেনি, আসবে। আগামী মাসের ১৬ তারিখে, বাংলাদেশ বিমানে। সকাল সাড়ে ন'টায়। ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। 'সব ব্যবস্থা আমি করব। আমি। ভয়ের কিছু নেই।' যেন সেই নেতা। সর্বময় কর্তা। সেই বন্ধুটির সাহায্য নেবে বুঝি যে তার সম্বন্ধী হবার তালে আছে।

'হেলেন তবু আসছে। আপনার আদরের দুই ছেলে হয়তো আর আসবে না।' হোসনেআরা বেগমের গলায় ঠিক মিষ্টি ফুটে ওঠে না। আজমল আলীর মনে হয় যেমন আরো বহুবার মনে হয়েছে, যে তাঁকে দাঁড় করানো হচ্ছে আসামির কাঠগড়ায়। তা ছেলেরা হয়তো আর আসবে না, সত্যি সত্যি আসবে না ফিরে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? এক ছেলে ডাক্তার, আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকাতে থাকে একজন, অন্যজন কানাডাতে। আসার কথা ছিল গত বছর। শেষ পর্যন্ত এলো না। দু'ভাই মিলে সপরিবারে গিয়ে উঠেছে বোনের কাছে, অস্ট্রেলিয়াতে। সেখানেই ছুটি কাটাবে। ছুটি কাটিয়ে ফিরে গেছে যে যার কর্মস্থলে।

ভারি ভাল মেয়ে ডায়ানা, হেলেন লিখেছে। বড় ছেলে আকরামের বউ আমেরিকান। সেই আমেরিকান বউটির প্রশংসা করেছে হেলেন। যে হেলেন এককালে কবিতা লিখত। মিছিলে যেত, হাত উঁচিয়ে শ্লোগান দিত, একাত্তরে

গ্রামে গিয়ে যে মেয়েদের জন্য প্রাইমারি স্কুল খুলেছিল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল কী করে একটা কলেজ খোলা যায় থানা হেডকোয়ার্টার্সে। বাংলাদেশ তো স্বাধীন হবেই, বলত সে। সেই স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। আজমল আলীর ভেতরেও উৎসাহের জোয়ার না হোক একটা স্রোত এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, আমি আছি তোর সাথে। গ্রামের কলেজে বাবা প্রিন্সিপ্যাল হবেন, মেয়ে অধ্যাপিকা। পড়াবেন তাঁরা গ্রামের মানুষদের, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা সমস্যা দূর করতে হবে। হোসনেআরা বেগম ছিলেন না এসব সলাপরামর্শের মধ্যে। গ্রামে তার সত্যি সত্যি কষ্ট হয়েছিল সেবার। গোসলের ব্যবস্থাটা না হয় করা গেল পুকুরের ঘাটে বাঁশের বেড়া দিয়ে। কিন্তু টয়লেট? বড় বিশ্রী ছিল সেই সমস্যা। ওদিকে হেলেন তো মনে হয় ফুটছে, টগবগ করছে উৎসাহে। 'তোদের, তোদের জন্যই তো এ দশা হলো মানুষের।' হোসনেআরা বলেছেন। তোদের অর্থ ছাত্রদের। সেই হেলেন এখন মার্কিন মেয়ে ডায়ানার তারিফ করে, বলে খুব লক্ষ্মী মেয়ে ওটি।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি রাশিয়াতে গিয়েছিল পড়তে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিল ঢাকাতে। বৃত্তি পেয়ে চলে গেল। গিয়ে ডিগ্রি নিল। মাঝখানে এসেছিল একবার। বলে গেল, পাস করেই ফিরবে সে। ফিরে একটি ফ্যাক্টরি দেবে মেশিনটুলের। বড় ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে, চিঠিপত্রে। বড় ভাইটিও এসেছিল। বলেছিল ক্লিনিক খুলবে। এ নিয়ে ছোট ভাই শাহেদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করল। কোথায় ঘর নেয়া যায় সেসব আলোচনা করল। ব্যাংক লোনের হাল কী জানতে চাইল বাবার কাছে। তারপর আসছি বলে সেই যে গেল চলে আর এলো না। এমনকি সে যে বিয়ে করেছে ভারতীয় এক বাঙালি মেয়েকে জানাল না সে খবরটাও। তা করবি কর, জানাবি তো? না, জানানোও নেই। জানলেন শেষে এক টেলিগ্রামে। ঈর্ষাপরায়ণ এক সহপাঠী টেলিগ্রাম করেছে 'শুভ' খবরটি জানিয়ে। সেই ছেলে বিয়ে করে বড় ভাইয়ের কাছে চলে গেছে আমেরিকাতে। সেখানে সুবিধা না করতে পেরে কানাডায়।

এবার আসবে বলেছিল সবাই মিলে, এলো না। হেলেন লিখেছে নির্মলাও ভালই; তবে ডায়ানা মনে হয় বেশি ভাল। ডায়ানাকে যেন বেশি বাঙালি মনে হয় লিখেছে সে। চিঠি পড়ে আজমল সাহেব হেসেছিলেন। একাকীই। এমনকি প্রাতঃভ্রমণের বন্ধুদেরকেও বলতে পারেননি কৌতুকের কথাটা। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের হাতে পড়লে আর রক্ষা থাকত না, একটা কুতকুতে কিন্তু রসিকতা করতেন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে। গা জ্বলে উঠত শুনলে। ঈশ্বর, তুমি

রসিকদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। আজমল আলী প্রায়ই বলেন। মনে মনে।

'আপনি! আপনিই দায়ী!' বড় তীব্র গলা হোসনেআরা বেগমের। বয়স বাড়ল, মেদও বাড়ল। কিন্তু বাড়ল দেখেন গলার তীক্ষ্ণতাও। আজমল আলী শুনেছেন, অনেকবার, অসংখ্যবার শুনেছেন এই অভিযোগ। কিন্তু বুঝতে পারেননি তাঁর দোষটা ঠিক কোথায়। স্পষ্ট করে যে বলবেন 'বুঝিয়ে বলো কথাটা' তাও বলা হয়নি। সাহস হয়নি বলবার। তবু কোথায় যেন সন্দেহটা থাকে, থেকেই যায় বোধ করি যে দায়িত্ব তাঁর আছে বৈকি। হোসনেআরা হয়তো মিথ্যে বলেন না। তিনিই তাগিদ দিয়েছেন। ছেলে দুটো ভাল ছিল। খুব যত্ন নিতেন তিনি। ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী নিয়ে তাঁর নিজের জীবনটা ঠিকমতো চলেনি, তারই ক্ষতিপূরণ কি চেয়েছিলেন ছেলেদের জীবনে? হয়তো তাই। ওরা এগিয়ে যাক। তিনি নিজে পারলেন না স্ত্রীর জন্য। অবস্থাপন্ন পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সেটা এ অঙ্গীকারেই যে, তিনি কলেজ ছাড়বেন, ছেড়ে সেই চাকরি নেবেন যে-চাকরি তিনি নিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের পেছনে সর্বক্ষণ লেগে থাকতেন। ভাল করেছে তারা। সব ক'টিই। বড় মেয়েটির অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে আইএ পাস করেই। ভাল ছাত্রী ছিল সে। তার পরেরটি ছেলে। ওই ডাক্তার, যাকে তিনি উৎসাহিত করেছেন আমেরিকা যেতে, কিন্তু সেখানে থেকে যেতে নয়। গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফিরে আসতে। তারপর হেলেন। হেলেন ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। স্ট্যান্ড করেছিল আইএ'তে। ফার্স্টক্লাস পেয়েছে অনার্সে; এমএ'তে। আফতাবও খারাপ নয়। রেজাল্ট ভাল ছিল বলেই বৃত্তি পেল রাশিয়াতে যাবার। অবশ্য হেলেনও চেষ্টা করেছে ভাইয়ের জন্য। যে-ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল সে তার কিছুটা প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। আজমল আলী ঠিক জানেন না। সবশেষে শাহেদ, তার ওপর তেমন প্রভাব পড়েনি বাপের। সে মায়ের ছেলে। তবু খারাপ করেনি অবশ্য, পরীক্ষায়।

এডুকেশন লাইনে থাকলে জীবনভর তিনি দরিদ্রই থাকতেন, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে এতটা করতে পারতেন না। এ আশঙ্কা ছিল। এবং সেটা, ছেলেমেয়েদের এই ভাল করে পড়াশোনা করতে দেয়াটা, অনেকটা ক্ষতিপূরণ বটে, তাঁর নিজের লাইনচ্যুতির। সেভাবেই দেখেছেন তিনি মনে মনে, নিজে নিজে।

শাহেদ বলল, রেনোভেট করতে হবে সমস্ত বাড়ি। এটাই সুযোগ। উপযুক্ত করতে হবে বাড়িঘর। হেলেন নিজেও কম নয়। পিএইচডি করেছে ইকোনমিক্সে। তবু সে যাহোক ঘরের মেয়ে। কিন্তু হেনরী? রীতিমতো

ব্রিলিয়ান্ট। এ্যানথ্রোপলজিতে পিএইচডি। তা যতই হোক সাদাসিধে, কি নরম-সরম, পরের বাড়ির মানুষ তো, পরের বাড়ির নয় কেবল, পরের দেশেরও। এ বাড়িকে নতুন করা চাই। হোসনেআরা বেগম অবিকল তাই বলেন। অন্তত একটা ঘর এয়ারকন্ডিশনড করে নাও। খরচ যা লাগে শাহেদ দেবে। হোসনেআরার ছোট বোনের ছেলেটা ডলার-পাউন্ডের ব্যবসায় করে কী একটা বাড়ি করেছে, দেখলে চক্ষু জুড়ায়, চক্ষু জ্বলেও। আর তাদের পুরাতন, হিন্দুদের তৈরি এই খুপচি বাড়ির তো না আছে শ্রী, না আছে শোভা।

'কিন্তু এয়ারকন্ডিশনার কি এই পুরনো বাড়িতে বসানো যাবে?' মিনমিন করে বললেন আজমল আলী, 'তার চেয়ে খুব ভাল করে মেরামত করে নেয়াটা ভাল।' রিটায়ার করার আগেই কিনেছেন এ বাড়ি। তিন ছেলের জন্য তিনটি বাড়ি হবে। পরিকল্পনা ছিল হোসনেআরার। দুটো করেছেন। কিন্তু এখন আর উৎসাহ নেই। তৃতীয়টার দরকারও নেই। কার বাড়িতে কে থাকে? তা এ বাড়িটা একেবারে ফেলনা নয়। শান্তিনগর পাড়াটা ভাল। বাড়িতে জায়গা আছে সামনে-পেছনে। মাধবীলতা আছে, ফুলও রয়েছে বাগানে। গুচ্ছ গুচ্ছ। রোজ সকালে আজমল আলী পানি দেন নিজের হাতে। বুঝবে তো বিলেতি সাহেব?

টেলিফোন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খবর যাচ্ছে চলে। নানা জায়গায়। এ শহরে। ভিন্ন শহরে। কানাডাতে, আমেরিকায়। আসছে। আমাদের হেলেন আসছে। ন'বছর পরে। না, একা নয়। একা আসবে কেন? স্বামী আসছে, ছেলে আসছে। যারা এতদিন বাড়ি দেখিয়েছে, গাড়ি দেখিয়েছে, ছেলের বউ, মেয়ের জামাই দেখিয়েছে তারা দেখুক এবার, দেখুক সবাই। বিলেতি প্রফেসর স্বামী নিয়ে আসছে প্রফেসর মেয়ে। যারা বলত গুজব ওসব, বিয়ে-শাদি কিছু নয়, থাকে একসঙ্গে, কবে দেখো শুনবে ছেলেটা ভেগে গেছে অন্য দেশে, তারা দেখুক এবার ঘটনা সত্যি, না মিথ্যে। হেলেনের সঙ্গে তার বাপেরই খাতিরটা বেশি মায়ের চেয়ে। কিন্তু মায়েরও ভাল লাগছে ভাবতে। ভীষণ সুশ্রী ছিল মেয়েটি, নিশ্চয়ই আরো সুন্দর হয়েছে। জার্মান ছেলেরা তো শুনেছেন দেখতে শুনতে সাহেবদেরও সাহেব, সে যখন পছন্দ করে বিয়ে করেছে তখন হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরার লোক কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আত্মীয় মহলেই রয়েছেন তাঁরা। চেনা আছে সবাইকে।

আসলে একটা অস্বস্তির ব্যাপার ছিল বৈকি। একটার পর একটা খবর এসেছে। বিয়ের খবর। ছেলেদের বিয়ের। মেয়ের বিয়ের। কোনোটাতেই তো ঠিক খুশি হবার কথা নয়। এমন তো কথা ছিল না। ছেলেরা ফিরবে। দেখেশুনে বিয়ে দেবেন। বড় ছেলের জন্য পাত্রী দেখা শুরুও হয়ে গিয়েছিল।

তা ছেলেরা যেমন-তেমন মেয়ের বিয়েটা একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল সবাইকে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলত না এ বিষয়ে। যেন প্রত্যেকেই লুকাচ্ছে ব্যাপারটা প্রত্যেকের কাছ থেকে। হেলেন, সেই আমাদের অতিশয় বাঙালি হেলেন, নিজের ডাক নামটাকেও যে অপছন্দ করত সে কি না বিয়ে করল বিদেশে! একি প্রেম, নাকি মোহ? নাকি অন্য কিছু? না, কেউ আলোচনা করেনি। ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে নিতে চায়নি। হেলেন কি এখনো শাড়ি পরে, কোমরে আঁচল গুঁজে? নাকি ছেড়ে দিয়েছে? খ্রিস্টান হয়ে গেছে কি? আর তার ছেলে? ওই যে নাতি? তার মাতৃভাষাটা কী?

কিন্তু এখন, এই উত্তেজনার মুহূর্তে এসব কথা পালিয়ে গেছে ভয় পেয়ে। হেলেন আসছে। ন'বছর পরে। বড় মেয়ে রুবি পেয়ে গেছে খবর। মিরপুরে থাকে, তাদের বাসায় টেলিফোন এসেছে এই কিছুদিন। একটু ম্রিয়মাণ থাকে সে। স্বামী চাকরি করে শিল্প কর্পোরেশনে। চাকরিটা খারাপ নয়। মিরপুরের বাড়ি নিজেই করেছে। কিন্তু ডিপেনডেন্ট আছে বেশ কয়জন। রুবির স্বামী লোকটা নিজেও কেমন বেয়াক্কেলে, চারটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। রুবি বলল হেলেন যা যা খেতে পছন্দ করে সব জানা আছে তার, ব্যবস্থা করবে সে নিজে। নারকেলের বরফি খায় খুব শখ করে, সেটা বানাতে হবে। আর পেয়ারা। মনে নেই সেবার সেই যুদ্ধের সময় অত বড় মেয়ে কেমন তরতর করে গাছে উঠে যেত পেয়ারা গাছে? একাত্তরে সকলে একসঙ্গে হয়েছিল। রুবিরা এসেছিল কুষ্টিয়া থেকে ভাসতে ভাসতে। হেলেনের খুবই পছন্দ বড় কই মাছ। জোগাড় করতে হবে শ্যামবাজার থেকে। মুড়িঘণ্টর ব্যবস্থাও হবে। কোনো চিন্তা নেই।

জেনে গেছে ঠিকা ঝি আমিনের মা। জেনেছে পাচক ইনসান মিয়া। পুরনো লোক সে। 'হেলেনকে তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি'— বলে সে। বাড়িয়েই বলে। কিন্তু একেবারে মিথ্যে বলে না। আর ওই সম্মানের সুযোগটাও নিয়ে তাকে সন্দেহ করার কারণ আছে যে, গোপনে সে কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিল হেলেনের কাছে। সম্ভবত এ তার বিবির বুদ্ধি। বিবি হাওয়া বলে থাকে শাহেদ, ইনসান মিয়ার স্ত্রীকে। ঠাট্টা করে। ইনসানের পতন ঘটাবে, ওই বিবি। আমিনা কাজ করত এ বাড়িতে। এখনো করে। তবে এখন সে ইনসানের স্ত্রী বটে। বাড়ির পেছনে ঘর আছে একটা, সেখানে সংসার পেতেছে। বিয়ের পর ইনসান বদলে গেছে। আগে বাজার করত। এখন আজমল আলী নিজেই যান বাজারে। এখন সে 'হালায় বাজারে দেয় না' বলে প্রায়ই অভিযোগ করে। ক্রমশ নির্লজ্জ হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। হেলেন চিঠিতে লেখে তার কথা। টাকা দেয়ার কথা বলে। সে খবর সব সময়

জানানো হয় না ইনসান মিয়াকে। জানলে মাথায় উঠবে। কিন্তু এখন শুনে ফেলেছে আসছে হেলেন আপা। দেখো গিয়ে হয়তো পরামর্শ বসেছে নিজের বউয়ের সঙ্গে হেলেন আপার সাহেব স্বামীর কাছে কীসের কীসের দরখাস্ত হাজির করবে তা নিয়ে।

আর শুনেছে আকবর আলী। আকবর আলী ভূইয়া। হেলেনের আকবর চাচা। কেবল হেলেনের নয়, সকলেরই। বাড়ির চাকরবাকর, আশপাশের বাড়ির ছেলেছোকরা, দোকানদার, কাজের মানুষ, কার না চাচা সে। একটু বোকা ধরনের। হাবাই বলা যায়। ভূইয়াবাড়ির ছোট ছেলে। তার উপরে ছিল আট-নয় ভাইবোন। মা'র সাধ্য ছিল না সবার যত্ন নেবেন। তদুপরি বাবা মারা গেলেন একেবারে আচমকা। পুলিশের ইন্সপেক্টর ছিলেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই মফস্বল থেকে ফিরে বললেন, বুকে ব্যথা। ব্যস, ব্যথা তো ব্যথাই সই। তাতেই শেষ। সেও একটা কারণ যে জন্য পরিবারের বড় ছেলে আজমল আলীকে চাকরি নিতে হয়েছিল ফুড ডিপার্টমেন্টে, কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে। পিতা আলী হোসেন ভূইয়া ম্যাট্রিকে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন গ্রামের স্কুল থেকে, হেডমাস্টার আশা রাখতেন ওই ছেলে খুব ভাল করবে পরবর্তী জীবনে। কিন্তু আলী হোসেন ভূইয়া আর পড়তে পারেননি। এখানে-সেখানে ছুটকো ছাটকি কিছু চাকরি করে শেষ দাখেল হয়েছিলেন পুলিশে। কিন্তু বিদ্যার প্রতি বাবার প্রচণ্ড একটা আগ্রহ ছিল। প্রকাণ্ড একটা আক্রোশও যেন, সেটি বাবার প্রথম পুত্র হিসেবে আজমল আলীও পেয়েছিলেন। যেটি তিনি সংক্রমিত করতে চেয়েছিলেন আপন সন্তানদের মধ্যে। পেরেছেন কি পারেননি সে বিচার কে করবে? তাঁর নিজের অন্তত সাহস নেই। মনে হয় পথ বড় জটিল, গন্তব্য সে শুধু কুহেলিকা। কেবল অন্ধকার জেগে ওঠে থেকে থেকে, সরব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় চতুর্দিক। একাত্তরে প্রায়ই এমন একটা অনুভূতি আসত তাঁর। তবু একাত্তরে ছেলেদের দেখতেন। যারা বলত যুদ্ধে যাবে। হেলেন ছিল। যার আশা ছিল অফুরন্ত। আজমল আলী নিজেও ভাবতেন, যাক না শহর শত্রুর হাতে চলে, গ্রাম তো আছে। এই গ্রামে আমার পত্তন করব নতুন জীবনের।

বাবা আলী হোসেনের তৈরি বাড়ি-ঘরগুলো মা রহিমা খাতুন রেখেছিলেন আগলে। মা কিছুতেই শহরে যাবেন না। মা'র ছেলেরা সকলে না হোক অনেকেই ভাল আছে। মেয়েদেরও খারাপ হয়নি বিয়ে। কিন্তু কী একটা একগুঁয়েমি ছিল মায়ের, কারো সংসারে থাকবেন না তিনি। একলাই পড়ে থাকতেন গ্রামে। বলা যায় মাটি আঁকড়ে। আর ছিল ওই তাঁর ছোট ছেলে, আকবর, হাবা ধরনের। টাইফয়েড হয়েছিল ছেলেবেলায়, যত্ন নিতে

পারেননি, মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে থাকবে, ছেলেবেলায় লালা পড়ত মুখ দিয়ে, এখনো হয়তো পড়ে, দেখা যাবে কাছে গিয়ে দেখলে। কথা জড়িয়ে যায় কিছুটা। কিন্তু সেবার অর্থাৎ ওই একাত্তরে ভীষণ ব্যস্ত ছিল এই লোক। ওই হাবা আকবর। ওই আকবর আলী চাচা। ভেতরে মা ব্যস্ত রান্নাবান্নায়, বাইরে ছেলে ব্যস্ত খাবারদাবার জোগাড় করায়। কত লোক এসেছিল সেবার। আজমল আলীর পুরো পরিবার। মেজ ভাইয়ের পরিবার। তারাও সবাই। এক বোনও এসে হাজির। কোন বাজারে ভাল ইলিশ মাছ উঠেছে, কোথায় কই মাছ পাওয়া যাচ্ছে, কার বাড়ির দুধ ভাল, এসব খবর আকবরই আনত। আর খবর আনত মিলিটারির আনাগোনার। যা শুনত সব নিয়ে আসত সবাইকে শোনাবে বলে। তখন থেকে আজমল আলীর সঙ্গেই আছে সে। শান্তিনগরের বাড়িতে একটা কামরা ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এক কোনায়। সেখানে ঘুমানোর সময়টা কেবল থাকে। বাদবাকি সময়টা বাড়ি পাহারা দেয় শিকারি কুকুরের মতো। দরজায় কেউ এলে, সে-ই এগিয়ে যাবে সকলের আগে। কি? কী দরকার? কাকে চাই? লোক বুঝে তার গলা ওঠানামা করে।

আকবর আলী কী করবে ভেবে পায় না। তবে খুব খুশি যে সে তো বোঝাই যায়। দৌড়ে গিয়ে খবর দিল মুদির দোকানে যেটা তার আসল সংসার। বাড়ির গেটের ওপরই মুদির দোকান। দোকানদার ছোকরা এককালে এ বাড়িতেই কাজ করত, বাড়ির চাকর ছিল। কোথা থেকে টাকা জোগাড় করল কে জানে। সে বলে ভিটেমাটি বিক্রি করেছে, হোসনেআরা বেগমের সন্দেহ মোটা হাতে সরিয়েছে এ বাড়ির জিনিসপত্র। তবে নিশ্চয়ই ভারি ধুরন্ধর, ধরা পড়েনি এখনো। না, আকবর আলীর যোগসাজশ ছিল এমন কথা কেউ বলেনি। তবে ভারি বন্ধুত্ব দুটিতে। আকবর আলী ওখানেই কাটায় সময়, সময় পেলে। হোসনেআরা কিছুই বলেন না। এটাকে মেনে নিয়েছেন, অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। নইলে সংসার চলে না। তবে দোকানদার হোসেন মিয়া উপকারী লোক। না বলবে না সে পারতপক্ষে। তার দোকানে না থাকলে আনিয়ে দেবে। বাকি দেবে। তার পসার বাড়ছেই কেবল। হোসেন মিয়াকে আকবর চাচা গিয়ে খবর দিল তার ভাতিজি আসছে, হেলেন আসছে। সাহেব স্বামী আসবে সাথে, সাহেব ছেলেও আসবে। খুব ভাল মেয়ে হেলেন। অমন মানুষই হয় না। সেবার যুদ্ধের সময় দেশে গিয়েছিল। এখনো ভোলেনি তার কথা দেশের বউ-ঝিরা। হেলেনের আসার খবর দোকান থেকে সওদার মোড়কের সঙ্গে চলে গেল সর্বত্র।

এ বাড়ির মেয়ে আসছে। ফিরছে হেলেন। পাড়ার কেউ কেউ আগে দেখেছে তাকে। তবে অনেকেই দেখেনি। দেখবে কী করে, হেলেন তো আজ